তুর্কী দরবেশ সাঈদ নূরসী (রহ)

এ.জেড.এম. শামসুল আলম

তুর্কী দরবেশ সাঈদ নূরসী (র)

এ. জেড. এম. শামসুল আলম

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

তুর্কী দরবেশ সাঈদ নূরসী (র)
এ. জেড. এম. শামসুল আলম
পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ২০

ইফাবা প্রকাশনা ঃ ২১৮০
ইফাবা লাইব্রেরী ঃ ৯২২.৯৭
ISBN : 984-06-0830-4

প্রথম প্রকাশ
এপ্রিল ২০০৪
চৈত্র ১৪১০
সফর ১৪২৫

প্রকাশক
মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন ঃ ৮১২৮০৬৮

কম্পিউটার কম্পোজ
নিউ হাইটেক কম্পিউটার
জি, পি, ক-৩৮, মহাখালী, ঢাকা

প্রচ্ছদ
গিয়াস উদ্দীন

মুদ্রণ ও বাঁধাই
তাওয়াক্কাল প্রেস
৮৭/১, নয়া পল্টন, ঢাকা-১০০০

মূল্য ঃ ১৮.০০ (আঠারো) টাকা মাত্র।

TURKI DARBESH SAYEED NURSI (R) [The Life-Sketch of Turkey Saint Sayeed Nursi (R)] : Written by A. Z. M. Shamsul Alam in Bangla and published by Muhammad Abdur Rab, Director, Publication, Islamic Foundation Bangladesh, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207. Phone: 8128068. April 2004
Web Site: www.islamicfoundation-bd.org
E-mail: info@islamicfoundation-bd.org

Price: Tk 18.00 ; US Dollar: 0.50

সূচিপত্র

তুর্কী দরবেশ সাঈদ নূরসী (র)	৭
তুর্কী মুজাদ্দিদ সাঈদ নূরসী (র)	১১
কামালী ফেতনা ও সাঈদ নূরসী (র)	১৬

লেখকের প্রকাশিত শতাধিক বইয়ের মধ্যে কয়েকটি

১. আল্লাহ্ তা'আলা এবং তাঁর সত্তা (পৃঃ ৯৬)–অনুবাদক ঃ শহীদ আকন্দ
২. আল-কুরআনের বাণী (পৃঃ ১১২)
৩. ঈমান ও তার মৌলিক উপাদান (পৃঃ ১৪৪)–অনুবাদক ঃ শহীদ আকন্দ
৪. মহানবী মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা) (পৃঃ ১৬৮)
৫. মহানবী ও শিশু (পৃঃ ৪০)
৬. ছোটদের ইসলাম (পৃঃ ৪৮)
৭. আমাদের মহানবী (সা) (পৃঃ ৭০)
৮. বর্ণ পরিচয় (দ্বিতীয় পাঠ) (পৃঃ ৬৮)
৯. বর্ণ পরিচয় (তৃতীয় পাঠ) (পৃঃ ৫৬)
১০. তাবলীগ ও ফজিলত (পৃঃ ১৫২)
১১. হায়াত, মওত, দৌলত (পৃঃ ১০৪)–অনুবাদ শহীদ আকন্দ
১২. সালাত ও সিয়ামের তাৎপর্য (পৃঃ ১২৮)
১৩. হজ্জের তাৎপর্য (পৃঃ ৯৬)
১৪. ইসলামী চিন্তাধারা (পৃঃ ৮৯২) (Islamic Thoughts-এর অনুবাদ নয়)
১৫. ইসলামী প্রবন্ধমালা (পৃঃ ৫৮৪)
১৬. ব্যবহারিক ইসলাম (পৃঃ ৩৮৩)
১৭. ইসলামী ঐতিহ্যে পরিবার পরিকল্পনা (অনুবাদ) (পৃঃ ৩৫১)
মূল ঃ ডঃ আবদেল রহিম উমরান মিশরী
১৮. হযরত শাহজালাল (র) (পৃ. ২৭৪)
১৯. শাহজালালের সঙ্গীগণ (যুগ্ম লেখক) (পৃঃ ৪৬)
২০. ইসলামী অর্থনীতির রূপরেখা (পৃঃ ৩২৩)
২১. ইসলামী অর্থনীতি (সম্পাদনা) (পৃঃ ১৪৯)
২২. ইসলামী ইন্সুরেন্স (তাকাফুল) (পৃঃ ১৭৬)
২৩. ইসলামী ব্যাংকিং (পৃঃ ১৬০)
২৪. ইসলামী রাষ্ট্র (পৃঃ ২৬০)
২৫. মসজিদ পাঠাগার (পৃঃ ৪৬)
২৬. মাদ্রাসা শিক্ষা (পৃঃ ১৯২)
২৭. আফগানিস্তান ও তালিবান (পৃঃ ১৪৪)
২৮. আফগান তালিবান (পৃঃ ৪০)
২৯. বিপ্লবী সাহাবী আবু জর গিফারী (রা) (পৃঃ ৬৬)
৩০. আবু জর গিফারী (রা) ঃ ইতিহাসে উপেক্ষিত একটি চরিত্র (যুগ্ম লেখক) (পৃঃ ৭১)
৩১. ইসলামে ভোগনীতি (পৃঃ ৪৪)

প্রকাশকের কথা

'তুর্কী দরবেশ সাঈদ নূরসী (র)' শীর্ষক বইটি প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ ও বিশিষ্ট লেখক জনাব এ. জেড. এম. শামসুল আলম লিখিত একটি প্রামাণ্য ও ব্যতিক্রমধর্মী পুস্তক। সাঈদ নূরসী (র) তুরস্কের এক বীর মুজাহিদ। তিনি প্রথম জীবনে রুশদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধ সংগ্রামে অংশ নেন। পরবর্তীতে মুসলিম উম্মাহর সর্বশেষ ঐক্যের প্রতীক সুদীর্ঘ ছয় শ' ঊনত্রিশ বছরের তুর্কী খেলাফতের পতনের পর তুরস্কের মুসলমানদের উপর ইসলাম-বিদ্বেষী মোস্তফা কামাল পাশার জুলুম-নির্যাতনের যে স্টিমরোলার চেপে বসেছিল তার প্রতিবাদ ও প্রতিরোধে সাঈদ নূরসীর (র) অবদানও অবিস্মরণীয়। অথচ বাংলাভাষী পাঠকের অনেকেই তাঁর নামের সাথে অপরিচিত।

সাঈদ নূরসীর (র) পুরো নাম বদিউজ্জামান সাঈদ নূরসী। তাঁর জন্ম পূর্ব তুরস্কের বিতলিশ অঞ্চলের নূরস গ্রামে ১৮৭৭ সালে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুরস্ক পরাজিত হলে তিনি রুশদের হাতে বন্দী হন এবং রুশ জেনারেল নিকোলাইভিচের নির্দেশে তাঁর ফাঁসির আদেশ হয়। কিন্তু ইসলামের একনিষ্ঠ অনুসারী সাঈদ নূরসীর (র) মহান আল্লাহ্‌র প্রতি অবিচল আস্থা ও নিজ ধর্মের প্রতি দৃঢ়তা দেখে জেনারেল নিকোলাইভিচ অভিভূত হন এবং তাঁর ফাঁসির আদেশ বাতিল করেন।

পরবর্তীতে মোস্তফা কামাল পাশার শাসনামলে তাঁর ধর্মবিরোধী কার্যকলাপের প্রতিবাদ করায় তাঁকে বহুবার কারাবন্দী করা হয়। আদর্শের প্রশ্নে অবিচল ও দৃঢ়চিত্ততার কারণে তাঁকে বহুবার হত্যার ষড়যন্ত্রও করা হয়। কিন্তু সাঈদ নূরসী (র) এতসব ষড়যন্ত্রের পরও আল্লাহ্ তা'আলার অশেষ রহমতে বেঁচে যান এবং স্বীয় আদর্শে আজীবন অটল থেকে তুর্কী জাতির দুর্যোগময় সংকটে আলোর দিশারী হিসেবে কাজ করেন। তুরস্কের অমানিশার অন্ধকারে শুকতারা হয়ে দীনের প্রদীপ প্রজ্বলিত রাখেন। ১৯৬০ সালের ২৩ মার্চ ৮৩ বছর বয়সে এ মহান সাধক ইন্তেকাল করেন।

আলোচ্য গ্রন্থটি সংক্ষিপ্ত হলেও তৎকালীন তুর্কী জাতিকে অধপতনের পঙ্কে নিমজ্জিত করার মোস্তফা কামালী ফেতনা প্রতিরোধে মুজাদ্দিদ হযরত সাঈদ নূরসীর (র) ঐকান্তিক প্রচেষ্টার চিত্র উঠে এসেছে। এ বইটি তুরস্কের এই ত্যাগী দরবেশের সংগ্রামী জীবন সম্পর্কে বাংলাভাষী পাঠকদের অবহিত করার উদ্দেশ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে প্রকাশ করা হলো।

মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

তুর্কী দরবেশ সাঈদ নূরসী (র)

মোস্তফা কামালী ফেতনার প্রেক্ষাপটে মুজাহিদ দার্শনিক বদিউজ্জামান সাঈদ নূরসী (র) তুরস্কের ধর্মীয় জীবনে ত্রাণকর্তা হিসেবে বিবেচিত হতেন। তাঁর জন্ম ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে পূর্ব তুরস্কের বিতলিশ শহরের নূরস গ্রামে। ৮৩ বছরের পরিণত বয়সে ১৯৬০ সনের ২৩ মার্চ, ২৫ রমযান ১৩৭৯-এ মহান মুজাদ্দিদ সাধক বদিউজ্জামান সাঈদ নূরসী (র) ইহলোক ত্যাগ করে জান্নাতের পথে রওয়ানা হন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

দরবেশ বদিউজ্জামান সাঈদ নূরসী (র) চিরকুমার (মুজাররদ) ছিলেন। বিবাহের সুন্নাহ পালন সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়ে সাঈদ নূরসী বলেন যে বিপদ-সঙ্কুল, ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ জীবনে তাঁর পক্ষে স্ত্রীর হক আদায় করা সম্ভব হবে না। স্বীয় দুর্বিসহ জীবনের সঙ্গে কোনো মহিলাকে জড়ানো হবে তার প্রতি জুলুম।

ইস্তাম্বুলের সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক জীবন ছিল পাশ্চাত্যঘেষা। দশ বছরের ইস্তাম্বুলের জীবনে সাঈদ নূরসী (র) কোনো মহিলার দিকে একবারও তাকাননি। এ বিষয়টি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হয়ে নূরসী মন্তব্য করেন, 'একটি ক্ষুদ্র জলন্ত দিয়াশলাই একটা বিশাল অরণ্যকে পুড়িয়ে ছারখার করে দিতে পারে। একজন ঈমানদার যখন কোনো নিষিদ্ধ বস্তু দর্শন করে এবং নিজেকে নীচে নামিয়ে ফেলে এবং তার পুনরাবৃত্তি করে, তখন সে তার বিশ্বাস ও চরিত্রকে সেভাবে পুড়িয়ে ধ্বংস করে ফেলে। তার পরিণতি হয় মর্মান্তিক'।

(নাজিমুদ্দিন শাহীনার বদিউজ্জামান সাঈদ নূরসী (তুর্কী গ্রন্থ) পৃঃ-২৯৮-৯৯)

নারী-পুরুষের মেলামেশা সম্পর্কে সাঈদ নূরসীর (র) এ ধরনের কঠোর অভিমত পাশ্চাত্য জীবন ঘেষা কামাল আতাতুর্কের অত্যন্ত নাপছন্দ ছিল। কামাল আতাতুর্কের অবাধ এবং বিকৃত যৌন জীবনের আদর্শ অনেকের নিকট অত্যন্ত প্রিয় ছিল। তার দু'বছরের বিবাহিতা পত্নী লতিফা খানম ১৯২৬ সনে স্বামীর অবাধ যৌন জীবনে অস্থির হয়ে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটান। এর পর কামাল আতাতুর্কের কোনো পারিবারিক জীবন ছিল না। তার জীবন ছিল রাষ্ট্রের সেবায় নিয়োজিত রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি।

সূফী দরবেশ নূরসী (র)

বদিউজ্জামান নূরসী (র) ছিলেন একজন সূফী দরবেশ। জেলে থাকাকালীন তিনি জুম'আর নামায আদায় করার অনুমতি চাইতেন। কিন্তু সে অনুমতি পাওয়া যেতো

না। কোনো কোনো সময় জেলখানায় তালাবদ্ধ কক্ষে তাঁকে দেখা যেতো না। কোন এক শুক্রবারে জুম'আর নামাযের সময় তিনি জেলে তাঁর কক্ষ থেকে উধাও। তদারকি কালে বিষয়টি সত্য প্রমাণিত হয়। কর্তৃপক্ষ ভাবলেন নূরসী পালিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে জরুরী তল্লাসী শুরু হলো। পুলিশ ও মিলিটারী বাহিনী শহরে খোঁজাখুঁজি শুরু করলো। একই দিনে তাঁকে ইমারতি, জ্ঞাপজারী এবং মিসরলী– এ তিনটি মসজিদে প্রায় একই সময় জুম'আর নামাযরত অবস্থায় দেখা গিয়েছে। নামাযের পর তাঁকে পুনরায় তাঁর নির্ধারিত কক্ষেই পাওয়া যায়।

শুক্রবারে জুম'আর নামাযের সময় তাঁর নির্দিষ্ট কক্ষে সাঈদ নূরসীকে (র) পাওয়া যায়নি– এ অপরাধে ১৯৪৮ সনের ৬ই ডিসেম্বর আদালতের রায়ে তাঁর দু'বছর অতিরিক্ত কারাদণ্ড হয়।

মুজাহিদ মুজাদ্দিদ নূরসী (র)

প্রথম মহাযুদ্ধ চলাকালে রাশিয়া অতর্কিতভাবে পূর্ব তুরস্ক আক্রমণ করে প্রধান শহর "এরজুলুম" দখল করে নেয়। এটা ছিল নূরসীর জন্মভূমি। সাঈদ নূরসী (র) স্বল্প সংখ্যক নিয়মিত বাহিনীর সঙ্গে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করে বিতলিশ অঞ্চলে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন এবং রণাঙ্গনে অপ্রত্যাশিত সাফল্য প্রদর্শন করেন অশ্বারোহী বাহিনীর লেঃ কর্নেল সাঈদ নূরসী (র)। ভান প্রদেশ এবং আর্মেনী অঞ্চলে কয়েকটি রণাঙ্গনে রুশ ও আর্মেনীয় বাহিনীকে তিনি পর্যুদস্ত করেন।

যুদ্ধের এক পর্যায়ে তুর্কী বাহিনী পরাজিত হয় এবং বদিউজ্জামান সাঈদ নূরসী (র) বন্দী হয়ে দু'বছর রুশ বন্দী শিবিরে মানবেতর জীবনযাপন করেন। বন্দী শিবিরে করণীয় কাজ না থাকায় তিনি যিকির এবং আধ্যাত্মিক সাধনায় মগ্ন হন। সাথে সাথে পলায়নের কৌশল অনুসন্ধান করতে থাকেন।

ফাঁসির মঞ্চে সাঈদ নূরসী (র)

ককেশিয়ান ফ্রন্টের রণাঙ্গনে প্রথম মহাযুদ্ধকালে প্রধান সেনাপতি ছিলো রুশ সম্রাট জারের পিতৃব্য নিকোলা নিকোলাইভিচ। সাঈদ নূরসী (র) যে বন্দী শিবিরে ছিলেন জেনারেল নিকোলাইভিচ একদিন তা পরিদর্শনে আসেন। পরিদর্শনকালে তিনি যখন সাঈদ নূরসীকে (র) অতিক্রম করছিলেন, তখন নূরসী (র) উঠে দাঁড়িয়ে জেনারেলকে সম্মান প্রদর্শন করেননি।

বিষয়টি জেনারেল নিকোলার নিকট ঔদ্ধত্যপূর্ণ এবং অসহনীয় মনে হলো। তিনি ভাবলেন– হয়ত বন্দী নূরসী (র) তাকে লক্ষ্য করেনি অথবা তার পরিচয় জানতে পারেনি। তাই তিনি ফিরে এসে নূরসীর সম্মুখ দিয়ে তিনবার অতিক্রম করেন। একবারও নূরসী (র) দাঁড়ালেন না দেখে তার সামনে থমকে দাঁড়িয়ে দোভাষীর মাধ্যমে জানতে চাইলেন নূরসী জেনারেলের পরিচয় জানে কী না।

নূরসী (র) জানালেন তা তিনি জানেন। জেনারেল তখন জানতে চাইলেন– বন্দী হয়েও না দাঁড়িয়ে কেন তিনি জেনারেলকে অপমান করলেন। নূরসী (র) বললেন, আমাকে দয়া করুন। আমি আপনাকে অপমান করিনি। আমার যা ধর্মীয় বিশ্বাস– তদনুসারে আমি কাজ করি।

জেনারেল নিকোলাইভিচ জানতে চাইলেন নূরসীর (র) ধর্মবিশ্বাস। নূরসী জানালেন, "আমি ইসলাম ধর্মীয় একজন আলেম। আমার বিশ্বাস অনুসারে একজন ঈমানদার ব্যক্তি অমুসলিম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আমি আপনার জন্যে উঠে দাঁড়ালে আমার ধর্মকে অপমান করা হতো। আমি আপনাকে কোনোরূপ অপমান করতে চাইনি।"

জেনারেল নিকোলাই এবার অত্যন্ত ক্ষেপে গিয়ে বললেন, "এর আগে তো তুমি আমাকে অপমান করেছো। এবার যা বললে– তাতে তো আমার সেনাবাহিনী, আমার জাতি– এবং মহামান্য জারেরও অপমান হলো। যা হোক যে অপরাধে তুমি বন্দী হয়েছো সে অপরাধের বিচারের জন্য আমি সামরিক আদালত গঠন করছি।"

জেনারেলের নির্দেশক্রমে সাঈদ নূরসীর (র) বিচারের জন্যে সামরিক আদালত গঠিত হলো। পূর্বাঞ্চলীয় তুর্কী স্বেচ্ছাসেবক অশ্বারোহী বাহিনীর লেঃ কর্নেল সাঈদ নূরসী (র) অখ্যাত সৈনিক ছিলেন না। সৈন্যদের নিকট তাঁর সম্মান ছিল পীরের মতো। তার জ্ঞানবত্তার খ্যাতিও ছিল।

খ্রিস্টান এবং মুসলিমদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ– সামরিক আদালতে এ বিষয়ে যুক্তি-তর্কের প্রতিক্রিয়া শুধু জার-বাহিনী নয়, প্রথম মহাযুদ্ধে তুরস্কের মিত্র– জার্মান এবং অস্ট্রিয়ার সৈন্যদের মধ্যেও প্রতিফলিত হতে পারে। তুর্কী ও জার্মান মিত্রতা এ নাজুক বিষয়টি নিয়ে প্রভাবিত হতে পারে।

নূরসীর জ্ঞানগর্ভ যুক্তি-তর্কের ধারা তুর্কী এবং জার্মান ও অস্ট্রিয়ার মুসলিম এবং খ্রিস্টান সৈন্যদের মধ্যে চলতে থাকলে তাদের মধ্যে ঐক্য ও মিত্রতার ভাব বিনষ্ট হতে পারে। জার্মান, অস্ট্রিয়ান তুর্কী সামরিক নেতারা রাশিয়ান শিবিরে বন্দী সাঈদ নূরসীকে (র) জারের পিতৃব্য জেনারেলের নিকট নতজানু হয়ে ক্ষমা ভিক্ষা করার আবেদন জানালেন।

নূরসী খ্রিস্টান ও মুসলিমের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ এ বিষয়ে যুক্তি-তর্ক না দিতে রাজী হলেন। ক্ষমা ভিক্ষা করতেও রাজী হলেন। কিন্তু নতজানু হতে সম্মত হলেন না। তিনি বললেন, "আমি এ দুনিয়া ত্যাগ করে যে দুনিয়ায় আমার প্রিয় নবী (সা) আছেন সে দুনিয়ার যাত্রী। এ দুনিয়া হতে সে দুনিয়ায় যেতে হলে আমার মৃত্যুরূপ একটি পাসপোর্ট প্রয়োজন। আমি ভেজাল পাসপোর্ট নিয়ে আমার সত্যিকার স্বদেশভূমিতে প্রবেশ করতে চাই না। সুতরাং আমার ঈমান ও ইয়াকিনের পরিপন্থী কোনো কাজ করতে পারবো না।" সংক্ষিপ্ত বিচারে সাঈদ নূরসীর (র) ফাঁসির আদেশ হলো।

সাঈদ নূরসী (র) ফাঁসির পূর্বে পনের মিনিট সময় চাইলেন। ফাঁসি দেখতে জেনারেল নিকোলাইভিচ স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। নূরসী (র) খুব ধীরে অজু করলেন। অত্যন্ত ধীরস্থিরভাবে দু'রাকাত নামায আদায় করলেন। ফাঁসির আসামী নূরসীর (র) দৃঢ় ইয়াকিন এবং প্রতীতিময়, ভয় লেশহীন নামায দেখে জেনারেল নিকোলাইভিচ অভিভূত হলেন। নূরসীর (র) চেহারা ছিল জান্নাতের প্রত্যাশায় আনন্দঘন, স্নিগ্ধ এবং জ্যোতির্ময়।

বদিউজ্জামান সাঈদ নূরসীর (র) দু'রাকাত নামায প্রবল পরাক্রান্ত রাশিয়ান জেনারেল নিকোলাইভিচের মনে দারুণ প্রতিক্রিয়া এবং আলোড়ন সৃষ্টি করলো। তিনি সালাম ফিরিয়ে দাঁড়াতেই রাশিয়ান জেনারেল অগ্রসর হয়ে নূরসীর (র) নিকট নতজানু হয়ে বললেন, "তোমার বিশ্বাসের দৃঢ়তা এবং গভীরতা আমাকে বিমুগ্ধ করেছে। আমি তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আমি কোর্ট মার্শালের রায় রিভিউ করে নাকচ করার নির্দেশ দিচ্ছি এবং তোমার কাছে পুনরায় ক্ষমা চাচ্ছি।"

বদিউজ্জামান সাঈদ নূরসী (র) আরো বহু অলৌকিক ঘটনার মাধ্যমে রাশিয়ার বন্দী শিবির হতে অন্তর্ধান হয়ে সেন্ট পিটার্সবার্গে পৌঁছলেন। সেখান থেকে পোল্যান্ড হয়ে তিনি বার্লিনে পৌঁছেন। নূরসী (র) তাঁর আত্মজীবনী 'তারিহ হায়াতে' জীবনের কোনো অলৌকিক ঘটনা উল্লেখ করেননি। তবে, বন্দী শিবির হতে অন্তর্ধানের সঙ্গী মেজর আলী হায়দারের বর্ণনা সত্য ইতিহাস বলে ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেছেন।

মেজর আলী হায়দারের একটি বর্ণনা নিম্নরূপ ঃ "আমি ও বদিউজ্জামান অলৌকিকভাবে পদব্রজে প্রশস্ত ভল্গা নদী অতিক্রম করি। আমরা পানির উপর দিয়ে এমনভাবে হাঁটছিলাম যেন কখনো আমরা পায়ের গোড়ালী পানিতে ডুবিয়েছি, কখনো পায়ের পাতা। মনে হচ্ছিল যেন আমরা তুষারের স্রোতে ভেসে বেড়াচ্ছি। আমি অত্যন্ত শিহরিত হচ্ছিলাম। যখন বিস্তীর্ণ ভলগা নদী অতিক্রম করলাম তখন বদিউজ্জামান আমাকে বললেন– আলী হায়দার। হে আমার ভ্রাতঃ! যে পরম করুণাময় প্রতিপালক মূসার (আ) জন্যে সমুদ্রকে সহজ করে দিয়েছিলেন, সে প্রভুই তোমার জন্যে বিশাল ভলগা নদীকে সহজ করে দিয়েছেন। কারো প্রতি আল্লাহ্‌র কুদরতী সাহায্য নিয়ে অহঙ্কার করা বা গৌরব বোধ করা নিষিদ্ধ।

(শুকরান ওয়াহীদ ঃ Author of the Risala-i-Nur, Badiuzzaman Said Nursi পৃঃ ১৩১)

অন্তিম ইচ্ছা

বদিউজ্জামান সাঈদ নূরসীর (র) একটি অন্তিম ইচ্ছা ছিল যে, তিনি দক্ষিণ-পূর্ব তুরস্ক সীমান্তে উরফা নামক স্থানে মৃত্যুবরণ করবেন এবং উরফায় অথবা নিকটবর্তী ইয়িরদির উপত্যকায় কোনো স্থানে সমাহিত হবেন। উরফাতে হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর কবর আছে।

মৃত্যু পথযাত্রী সাঈদ নূরসীর (র) অন্তিম দিনগুলোতেও তার বিরুদ্ধে তুর্কী সরকারের গ্রেফতারী পরোয়ানা ছিল। তাঁর ভক্ত ছাত্রবৃন্দ পুলিশের চোখকে ফাঁকি দিয়ে তাঁকে বহু চেষ্টায় অনেক দূর থেকে উরফা নিয়ে আসেন। তাঁর উরফায় আগমনের বিষয় অবহিত হয়ে সরকারী বাহিনী তাকে উরফাতেও ধাওয়া করে। কিন্তু স্থানীয় মেয়র ও জনসাধারণের বাধার সম্মুখে তাঁকে গ্রেফতার করা সম্ভব হয়নি। তাকে গ্রেফতার করার জন্য অতিরিক্ত বাহিনী পাঠান হয়। কিন্তু এরই মধ্যে তাঁর ওফাত হয়। হযরত ইব্রাহীম (র)-এর মাযার প্রাঙ্গণে তাকে সমাহিত করা হয়।

তাঁর কবর গোপন রাখার জন্য ভক্তদের নিকট সাঈদ নূরসীর (র) আর এক ওসিয়ত ছিল। কারণ, তিনি চাইতেন না তাঁর কবর মাযারে পরিণত হোক এবং মাযার পূজা হোক। এ সম্বন্ধে তাঁর কড়া হুশিয়ারি ছিল। তিনি বলেছিলেন, "যে ভাইয়েরা আমার যিয়ারত করতে চান, তারা পৃথিবীর যেখানেই থাকুন- পবিত্র ফাতেহা পাঠ করে উপহার পাঠিয়ে দিলেই অনেক বেশী হবে। আমার কবরের কাছে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। একথা আমি তোমাদেরকে বলে যাচ্ছি যে, আমার কবর কোথায়- তা যেন কাউকে জানানো না হয়।" বদিউজ্জামান সাঈদ নূরসীর (র) এই ইচ্ছাও তার শত্রুদের উদ্যোগে পূরণ হয়।

১৯৬০ সনের ২৭ মে রাষ্ট্রপতি জালাল বায়ার ও প্রধান মন্ত্রী আদনান মেন্দরেসকে অপসারণ করে তুরস্কের সেনাপতি জেনারেল গুরসল ক্ষমতা দখল করে। নতুন জান্তা সাঈদ নূরসী (র)-এর বিরোধী ছিল। ক্ষমতা দখল করার পর বিরাট সেনাবাহিনী প্রেরণ করে তারা নূরসীর পাকা কবর ভেঙ্গে মৃতদেহ ইয়িরদির নামক এলাকায় অজ্ঞাত স্থানে মৃত্যুর ১১১ দিন পরে সমাহিত করে। আশ্চর্যের বিষয় ১১১ দিন পরেও তার দেহটি ছিল অক্ষত, অপরিবর্তিত এবং সতেজ।

তুর্কী মুজাদ্দিদ সাঈদ নূরসী (র)

তুরস্কের স্বৈরশাসক মোস্তফা কামাল পাশার শাসনকাল ছিল দীনদার মুসলিমদের জন্যে মহান রাব্বুল আলামীনের খাস গজবের আমল। সে সময় দীনের প্রতিটি বিভাগে যে ধরনের হামলা হয় এ ধরনের হামলা স্পেন ও ফিলিপাইন ভিন্ন পৃথিবীর অন্য কোথাও বা কোনো মুসলিম অধ্যুষিত দেশে হয়নি।

দীনদার তুর্কী মুসলিমদের চরম দুর্দিনে যে তুর্কী আধ্যাত্মিক সূফী দরবেশ তাঁর ঈমান, আকীদা, তাকওয়া নিয়ে ভারতীয় মুজাদ্দিদ আলিফে সানী সাইয়েদ আহমদ (র)-এর অনুরূপ সরকারের বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি হলেন তুর্কী মুজাহিদ মুজাদ্দিদ বদিউজ্জামান সাঈদ নূরসী (র)।

এ দরবেশ বদিউজ্জামান সাঈদ নূরসী (র) বাংলাদেশের ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি ও বুদ্ধিজীবীদের নিকট অতি অপরিচিত। তাঁকে জানতে আমাদের অবহেলা যদি কিছু

হয়ে থাকে তার এক ধরনের কাফ্ফারা হতে পারে বদিউজ্জামান সাঈদ নূরসীর (র) উপর এখন থেকে বিভিন্ন ভাষায় রচিত পুস্তক পাঠ করা এবং বদিউজ্জামান সাঈদ নূরসী (র)-এর নামে সংস্থা, সোসাইটি, পাঠচক্র ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করে বদিউজ্জামান সাঈদ নূরসী ও তৎরচিত গ্রন্থ 'রিসালে নূর' চর্চা জোরদার করা।

অহিংস সংগ্রাম

কামাল আতাতুর্কের আমলে তুরস্কে ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে যে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম হয়, তাতে ইরানের আয়াত উল্লাহ রুহুল্লাহ্ খোমিনীর ন্যায় সবাক সমালোচনা ও প্রতিরোধের কোন সুযোগ ছিল না। তুর্কী জাতি এবং উলামায়ে-কেরামকে কামাল আতাতুর্কের ন্যায় ফেরাউনী শার্দুলের সম্মুখে ফেলে তুরস্ক থেকে ইউরোপে হিজরত করার ইচ্ছাও বদিউজ্জামান সাঈদ নূরসীর (র) ছিলো না।

সাঈদ নূরসী (র) অনেকটা ভারতীয় নেতা মোহন চাঁদ করম চাঁদ গান্ধীর ন্যায় নিরস্ত্র, অধিকন্তু নির্বাক সংগ্রামের পথ অবলম্বন করেন। তাঁর লেখায় তুর্কী সরকারের কোন প্রকার সমালোচনা দূরের কথা, উল্লেখই থাকত না। তুরস্কের ধর্মীয় দলন নীতির বিষয় ছিল সম্পূর্ণ উপেক্ষিত।

বদিউজ্জামান সাঈদ নূরসী (র) কারো সমালোচনা না করে তাঁর লেখায় ইসলামী বিধি-বিধানের যৌক্তিকতা এবং সারকথা উপস্থাপনের তরীকা অবলম্বন করেন। তিনি এমন বাক্য বা ভাব প্রকাশ করেননি, যা তুর্কী আইনে দণ্ডনীয় হতে পারে। শুধু ইসলামের শ্রেষ্ঠত্বই তাঁর বক্তৃতা, প্রবন্ধ ও গ্রন্থাবলীতে প্রতিফলিত হতো। তবুও সাঈদ নূরসীর (র) অর্ধেক জীবন জেলখানায়, নির্বাচনে এবং অন্তরীণ বা নজরবন্দী দশায় কাটে।

জ্ঞানচর্চায় বিঘ্নতা

বদিউজ্জামান নূরসীকে (র) জেলে থাকাকালে লেখার জন্য কোন কাগজ দেয়া হতো না। জেলের সুইপার তাঁকে সিগারেটের প্যাকেট, ঠোঙ্গা, বর্জ্য কাগজ সরবরাহ করতো। এগুলোতে তিনি লিখতেন। সুইপাররা এ কাগজ বর্জ্য হিসেবে জেলখানার বাইরে ফেলতেন। তাঁর ভক্তরা কারাগারের বাইরের ডাস্টবিন থেকে এগুলো কুড়িয়ে নিতেন। এমন সব অসুবিধার মধ্যে থেকেও তিনি লিখেছেন প্রচুর। লেখার জন্য বহুবার তাঁকে বন্দী করা হয়। নানা প্রকার অত্যাচার ও নির্যাতন চালানো হয়।

নির্যাতনের শিকার

আরবী কুরআন সংরক্ষণ নিষিদ্ধ করে তুর্ক গ্রাণ্ড এসেম্বলী যে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল (অধ্যাদেশ নম্বর ১১১/৫ নভেম্বর ১৯২৮) বদিউজ্জামান সাঈদ নূরসীর (র)

কাছে আরবী কুরআন পাওয়ায় উপরোক্ত নিষেধাজ্ঞা অমান্যজনিত অভিযোগে তাঁকে বিশ মাস কারাদণ্ড দেয়া হয়।

তৎকালীন তুরস্কে কুরআনের উদ্ধৃতি দিয়ে লেখারও স্বাধীনতা ছিলো না। তাঁকে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে অগ্রসর হতে হতো। তাঁর একটি লেখায় পোশাকের ব্যাপারে কুরআনের উদ্ধৃতি থাকায় ঐ লেখাটিকে ১৯২৫ এবং ১৯২৭ সনের টুপি ও বোরকা নিষিদ্ধকরণ অধ্যাদেশের সাথে সাংঘর্ষিক বলে ধরা হয় এবং এ অভিযোগে তাঁকে ১১ মাসের কারাদণ্ড দেয়া হয়।

বদিউজ্জামান নূরসীকে (র) যে কতবার গ্রেফতার করা হয়, তার হিসাব তিনি বা তাঁর আত্মীয়-স্বজন বা অনুসারীগণ রাখতে পারেননি। তবে তাঁকে কতবার বিচারের জন্য আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়েছিলো তার একটি পরিসংখ্যান সরকারী তথ্য থেকে সংকলন করার চেষ্টা করা হয়। আদালতের কাঠগড়ায় তিনি দাঁড়িয়েছিলেন ১৫০০ শত বারেরও বেশী। সমকালীন মুসলিম বিশ্বে এ দিক দিয়ে তুলনীয় কোনো মজলুম সূফী দরবেশ খুব সম্ভব ছিলেন না।

সাঈদ নূরসী (র) বিনা বিচারে কারাগারে ছিলেন জীবনের দীর্ঘ সময়। কৃষ্ণ সাগরের তীরবর্তী কাস্তামনোতে তিনি নির্বাসিত জীবনযাপন করেন একনাগাড়ে আট বছর।

কাস্তামনোতে ১৯৩৬ সন হতে ৮ বৎসরাধিক নির্বাসনে কাটাবার পূর্বে বদিউজ্জামান সাঈদ নূরসী (র) ১৯২৬-৩৩ পর্যন্ত আট বৎসর আঙ্কারার অদূরে বারলাইতে গৃহবন্দী জীবনযাপন করেন। এ সময় তিনি রেসালে নূরের ১৩০টি অধ্যায় রচনা করেন। শুধু দু'বারের রাজবন্দী থাকাকালে তাঁর কারাবাসের মেয়াদ হলো ১৬ বছর।

হত্যার প্রচেষ্টা

গুপ্তঘাতকের মাধ্যমে সাঈদ নূরসীকে (র) হত্যার বহু চেষ্টা করা হয়। কিন্তু আল্লাহ্‌র কুদরতে তা ব্যর্থ হয়। একবার তাঁকে অনির্দিষ্ট কালের জন্য তুর্কী ক্রিমিনাল একট-এর ১৬৩ ধারায় ১৯৫৩ সনের ১২ মে ইসপার্তা শহরে গ্রেফতার করা হয় এবং অনির্দিষ্ট কালের জন্যে আটকাদেশ দেয়া হয়।

এ সময় তাঁকে এস্কিশহর নামক স্থানে পাঠানো হয় এবং গোপন নির্দেশে বলা হয় যেন এস্কিশহর কারাগারে নেয়ার পথেই তাঁকে হত্যা করা হয়। "রুহি" নামীয় যে তুর্কী কনটিনজেন্ট কমান্ডার এস্কিশহরে নেয়ার দায়িত্বে ছিলেন তিনি এ নির্দেশ পালন করেননি। তাতে তিনি চাকুরীচ্যুত হন।

কনটিনজেন্ট কমান্ডার রুহির বিরুদ্ধে ঐ বিচারকালে আনীত প্রকাশ্য অপরাধ ছিল যে, তিনি নামায পড়ার জন্য বদিউজ্জামান নূরসীর (র) হাতকড়া খুলে দেন। নামায

পড়ার সুযোগ দানের জন্যে যদি একজন সেনা কমান্ডারকে চাকুরী হারাতে হয়, সাঈদ নূরসীর (র) নিজের উপর কত ধরনের অপরাধের জন্যে শাস্তি হতে পারে তা অনুমান করা যায়।

বদিউজ্জামান সাঈদ নূরসী (র)-এর প্রভাব তুর্কী সেনাবাহিনীর বেশ কিছু কর্মকর্তার উপর পড়েছে। কারণ তারা অন্তরীণ থাকাকালীন বদিউজ্জামান নূরসীকে (র) নিকট থেকে দেখেছেন। তাঁকে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে ভালাবাসার সুযোগ পেয়েছেন।

নূরসীর রচনা পাঠের অপরাধ

১৯৩৫ সনে তুরস্কের ইসপার্তা শহরে তার বিরুদ্ধে 'রেসালে নূর' বা কুরআনের আয়াতের ভাষ্য প্রচারের অভিযোগে আদালতে হাযির করা হয়। সেনাবাহিনীর জনৈক কর্নেল আসিম বে-এর নিকট 'রিসালে নূর'-এর অংশ বিশেষ পাওয়া যায়। আসিম বে-কে সাঈদ নূরসী (র) নিজেই লেখাগুলো পড়তে দিয়েছিলেন। সত্য সাক্ষ্য দিলে সাঈদ নূরসী (র) বিপদে পড়বেন। তাতে তাঁর মৃত্যুদণ্ড হতে পারে। জেল তো হবেই। মিথ্যা বললে সদা সত্য বলার জন্য সাঈদ নূরসীর (র) বিশ্বাসের অবমাননা করা হয়।

কর্নেল আসিম বে পড়লেন উভয় সঙ্কটে এবং ভীষণ বিপদে। তিনি তাঁর বন্ধুদের বলেন যে, সমস্যা সমাধানের একটি পথ তিনি নিজে পেয়েছেন। তা হলো সাক্ষী দেয়ার পূর্বে রাব্বুল আলামীনের নিকট মৃত্যু কামনা করবেন। নিজের মৃত্যু কামনা ইসলামে বৈধ নয়। কিন্তু মিথ্যা বলা অথবা প্রিয় উস্তাদ সাঈদ নূরসীকে (র) অপরাধী প্রমাণ করা কোনোটাই তার নিকট সহনীয় ছিল না। আল্লাহ্‌র কুদরত! আদালত কক্ষেই জেরার সময় সাক্ষী কর্নেল আসিম বে মৃত্যুবরণ করেন।

বিষ যোগে হত্যার চেষ্টা

সাঈদ নূরসীকে (র) নয় বার বিষ মিশিয়ে হত্যার চেষ্টা করা হয়। মহান আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে প্রত্যেকবার রক্ষা করেছেন। নূরসী বলতেন, "আমি আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস করি। মৃত্যু একবারই আসে। আগমনের সময় কেউ বদলাতে পারে না।" নূরসী বিশ্বাস করতেন আল্লাহ্‌র উপর তাওয়াক্কুল দৃঢ় হলে এবং আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে পান করলে বিষ কিছুই করতে পারবে না। খাওয়ার পূর্বে আল্লাহ্‌র নাম ভুলে গেলে ভিন্ন কথা।

বদিউজ্জামান সাঈদ নূরসীকে (র) আদালতে মামলার মাধ্যমে ফাঁসি এবং গুপ্ত ঘাতকের মাধ্যমে হত্যার বহু চেষ্টা করা হয়েছে। তাঁর বহু অনুসারীকে বিভিন্নভাবে হত্যা করা হয়েছে। হত্যার হোতারা নূরসী বেঁচে যাওয়ার অলৌকিকতায় স্তব্ধ হয়ে গেছেন। নূরসী (র) বেঁচে গেছেন।

'রিসালে নূর' তাফসীরগ্রন্থ

বদিউজ্জামান সাঈদ নূরসীর (র) লেখাসমূহের একটি সংকলন হয়েছে "রেসালে নূর" নামে। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫০০০-এর বেশী। "রিসালে নূর" কুরআনের নির্বাচিত আয়াতের একটি ভাষ্য গ্রন্থ। পুরো কুরআনের ধারাবাহিক তফসির নয়। বিধিগত নিষেধাজ্ঞা থাকার ফলে সমকালীন অবস্থার প্রতি সম্পর্কহীনভাবেই বদিউজ্জামান সাঈদ নূরসীকে লিখতে হয়েছে। তাই তাঁর লেখায় জ্বালাময়িতা নেই, সমকালীন প্রাসঙ্গিকতা নেই, চিরন্তনতা আছে। বদিউজ্জামানের রচনাবলী কামাল আতাতুর্কের আমলে নিষিদ্ধ ছিলো। কিন্তু তাঁর লেখার আবেদন সর্বকালের মানুষের কাছে থাকবে।

সার্বজনীনতা

যে মানুষটি তুর্কী জাতির এক দুর্যোগময় সময়ে আলোর দিশারী হিসেবে কাজ করেছেন তাঁর লেখা হতে সকল দেশের মানুষেরই শিক্ষণীয় অনেক কিছু আছে। বদিউজ্জামান সাঈদ নূরসীর (র) লেখা বাংলায় বা ইংরেজীতে অনুবাদ তেমন হয়নি। বাংলার অনূদিত প্রথম পুস্তকটি হলো 'আল-কালিমাত' (রিসালে নূর সংগ্রহমালা হতে)। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬৪। অনুবাদক ঃ ইয়াহিয়া ইউসুফ নদভী। প্রকাশক রিসালে নূর ট্রাস্ট। বাংলা ভাষায় বদিউজ্জামান সাঈদ নূরসী (র)-এর প্রথম পুস্তকটি লিখেছেন মাহফুজ সাইফুল্লাহ্। প্রকাশ করেছেন মদীনা পাবলিকেশন্স।

সাঈদ নূরসী (র)-এর লেখাগুলো এক অর্থে এলহামপ্রাপ্ত জ্ঞান হিসেবে অনেকে ধারণা করেন। তাঁর জ্ঞান সাধনা সম্পর্কে তিনি যা লিখেছেন তার একটি হলো–

"আমি সত্যকে পেতে চেয়েছি যুক্তি-তর্ক দিয়ে। কিন্তু লক্ষ্য করেছি যুক্তি-তর্ক ভর করে মহাজ্ঞানী মহাজনেরা জ্ঞানের রাজ্যে অর্ধেক পথও অতিক্রম করতে পারেননি। আল-ফারাবী, ইব্নে সিনা, এরিস্টটল-এর মত মহাপুরুষগণ কিছুটা পথ পেয়েছেন মাত্র। যে পথ ধরে যুক্তি-তর্ক শাস্ত্রে মহাপণ্ডিতগণই মহাসত্যের ধারে কাছে পৌছতে পারেননি, সাধারণ মানুষের পক্ষে তো এ পথ বিপদজ্জনক। পরিণতিও হবে ভয়াবহ।"

"এরপর আমি সূফীবাদের দিকে ঝুঁকলাম এবং তা বোঝার চেষ্টা করলাম। আমি দেখলাম "তাসাউফ" হচ্ছে সবচাইতে উজ্জ্বল এবং সত্যে পৌছার সবচেয়ে জ্যোতির্ময় তরীকা। কিন্তু এখানে প্রয়োজন সাংঘাতিক রকমের সতর্কতা। একটু ভুল হলেই সত্যচ্যুতি এবং সর্বনাশ অবধারিত। উচ্চস্তরের সাধনার জন্যই এ পথ গ্রহণযোগ্য। সাধারণের জন্য নয়।"

"অবশেষে সত্য প্রাপ্তি পথের বাধা-বিপত্তিতে ক্লান্ত, বিষন্ন, অবসন্ন হয়ে আমি সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করলাম কুরআনের নিকট। আল্লাহ্র কাছে আমার হাজারো শোকর! কুরআনে পেয়েছি আমার সকল দিশা বা নির্দেশ, যা আমি বর্ণনা করেছি 'রিসালে নূর'-এ। কুরআনের বাণী মানুষের কাছে সহজবোধ্য করে উপস্থাপনের এটা আমার একটি অক্ষম প্রচেষ্টা।"

কামালী ফেতনা ও সাঈদ নূরসী (র)

ভারত সম্রাট জালাল উদ্দিন আকবরের ধর্মীয় পাগলামী 'দীন-ই-ইলাহী' প্রবর্তনের পর এবং রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় এ ধর্মীয় ফেতনা প্রচারের প্রেক্ষাপটে ভারতীয় মুসলিমগণ এক ভীষণ ফেতনা বা ধর্মীয় বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। তৎকালীন শ্রেষ্ঠ মনীষী আবুল ফজল, ফৈজি প্রমুখ নব রত্ন ছাড়াও উলামায়ে "সু" বা রাষ্ট্রীয় অনুগ্রহপুষ্ট আলেম, আমির-উমরাহ, ব্যবসায়ী অনেকেই বৈষয়িক স্বার্থের কারণে রাষ্ট্রীয় ধর্ম 'দীন-ই-ইলাহী'-এর প্রতি সহানুভূতিশীল হয়েছিলেন।

'আল্লাহ্ জাল্লা জালালুহু" 'আল্লাহু আকবার' তাসবিহ-এর সঙ্গে ছান্দিক মিল রেখে 'জাল্লা জালালুহু– জালাল উদ্দিন আকবর' ধ্বনিও আকবরের রাজদরবারে দেয়া হতো। বাদশাহ আকবরের সম্মুখে রুকুর মত ভঙ্গিতে নত হওয়া সভাসদগণ শুরু করেন। সেজদার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ষাষ্ঠাঙ্গ প্রণাম বিশেষ সম্প্রদায়ের ব্যক্তিদের নিকট গৌরবের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়।

আকবর প্রবর্তিত এবং বহু শতাব্দী পর্যন্ত আস্তে আস্তে গড়ে উঠা ধর্মীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী এবং বলিষ্ঠ প্রতিবাদ উচ্চারিত হয়েছিল সুলতানুল আওলিয়া মুজাদ্দিদ-ই-আলফে সানী সৈয়দ আহমেদ সারহিন্দের (র) কণ্ঠে। মুজাদ্দিদ-ই-আলফে সানী যে বিদ'আত বিরোধী সংগ্রাম উপমহাদেশে শুরু করেছিলেন তা আজও চলছে।

বাংলা ভারত উপমহাদেশের ইতিহাসে আল্লাহ্র দীনকে জীবিত রাখার জন্যে মুজাদ্দিদ-ই-আলফে সানী যা করেছিলেন তুরস্কে মোস্তাফা কামালী ফেতনা হতে তুরস্কবাসীর ঈমান আকীদা সংরক্ষণের জন্যে অনুরূপ অবদান রেখেছেন সূফী দরবেশ মুজাহিদ বদিউজ্জামান সাঈদ নূরসী (র) (১৮৭৭-১৯৬০ খ্রীঃ)।

অথচ তুর্কী মুজাদ্দিদ বদিউজ্জামান সাঈদ নূরসী (র) বাংলাদেশে এখনো একটি স্বল্প পরিচিত নাম। বিংশ শতাব্দীতে তুরস্কের ইতিহাসে বদিউজ্জামান সাঈদ নূরসীর (র) অবদান বুঝতে হলে মোস্তফা কামালী ফেতনার কিছুটা স্মৃতিচারণ করা যেতে পারে।

তুরস্কের জাতীয় জীবনে মোস্তফা কামাল পাশা সম্রাট আকবর অপেক্ষা আরো বড় ফেতনা হিসেবে আবির্ভূত হন। প্রথম মহাযুদ্ধে জার্মানী এবং অস্ট্রিয়ার সহযোগী দেশ হিসেবে তুরস্কের পরাজয়ের পর সাম্রাজ্যবাদী শক্তি আফ্রিকা, এশিয়া, ইউরোপের বিরাট এলাকাব্যাপী তুর্কী খেলাফতকেই শুধু খণ্ড-বিখণ্ড করেনি, মূলত তুরস্ককেও টুকরো টুকরো করে ফেলার ষড়যন্ত্র ও বিজয় উল্লাসে মদমত্ত হয়ে উঠে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষে মিত্র শক্তি পরাজিত জার্মানীকে চার ভাগে বিভক্ত এবং জাপানকে যুক্তরাষ্ট্রের পদানত করেছিল। মার্কিন শাসনাধীনে মহাযুদ্ধ পূর্বেকার মহা পরাক্রমশালী জাপানী প্রতিরক্ষা বাহিনীকে সম্পূর্ণ অবলুপ্ত করে দেয়া হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর জার্মানী এবং জাপানের ভাগ্যে যা ঘটেছিল কামাল আতাতুর্কের আবির্ভাব না হলে তুরস্কের ভাগ্য আরো করুণ হতো। এ পরিণতি থেকে তুরস্ককে রক্ষা করে কামাল আতাতুর্ক তুর্কী জাতির সম্মুখে দেবতার পর্যায়ে পৌঁছে যান।

যদিও বৃটিশ নেতৃত্বাধীন মিত্র বাহিনীর বিরুদ্ধে তুর্কী খেলাফত ও খলীফার প্রতি আনুগত্যের শপথ নিয়ে মোস্তফা কামাল পাশা জিহাদ শুরু করেছিলেন, কিন্তু একটির পর একটি যুদ্ধে গ্রীস এবং তুর্কী শত্রুদেরকে পরাভূত করার পর তিনি নিজেই একজন ফেরাউন বনে যান।

তাঁর অবদানের জন্য তুর্কী জাতি ছিল তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ এবং অনুগত। তাই মোস্তফা কামাল আতাতুর্কের ধর্মীয় পাগলামী সেনাবাহিনী মেনে নেয়। তুর্কী জনসাধারণ হয়ে পড়ে হতভম্ব, কিংকর্তব্যবিমুঢ়।

তুর্কী খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১২৯৯ সালের ১লা নভেম্বর, অটোমান সুলতান সেলিমের মাধ্যমে। এ খেলাফত মোস্তফা কামাল পাশা আঙ্কারা জাতীয় সংসদের এক ভাষণে (১৯২৮) বিলুপ্ত করার ঘোষণা প্রদান করেন। ১৯২৮ সনের ১লা মার্চ নির্বাচন বিহীন এবং মোস্তফা কামাল সৃষ্ট সংসদে খেলাফত বিলুপ্ত আইন পাস হওয়ার পর আনুষ্ঠানিকভাবে ৬২৯ বছরব্যাপী বিরাজমান খেলাফত বিলুপ্তির ঘোষণা দেয়া হয়।

১৯৩৮ সনের ১১ নভেম্বর মহাকুশলী সমরনায়ক, কঠোর পরিশ্রমী, মদ্যপায়ী, অবাধচারী রাষ্ট্রনায়ক কামাল আতাতুর্ক ৫৭ বছর বয়েস লিভার সিরোসিস রোগে মৃত্যু বরণ করেন। তৎপূর্বেই তুর্কীদের জাতীয় জীবন থেকে ইসলামকে নির্বাসিত করার জন্য যা তার করার ছিল তিনি তা সম্পন্ন করেন। ১৯২৪ সালের ৩রা মার্চ মোস্তফা কামাল পাশা তুরস্কের সকল মাদ্রাসা এবং ইসলামী প্রতিষ্ঠান নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। মাদ্রাসাসমূহের রেজিস্ট্রেশন বাতিল করেন।

দেশের আইন বিভাগ থেকে আলেমদেরকে কামাল পাশা বরখাস্ত করেন। ধর্মীয় চেতনা-সম্পন্ন ঊর্ধ্বতন আমলাদেরকে চাকুরী হতে অব্যাহতি দেন। প্রতিবাদী শত শত আলেম, মুফতী, শায়খ, সাধারণ মুসলমানদেরকে গুপ্ত হত্যার নীতি প্রবর্তন করেন। তুর্কী পেনাল কোডে কামাল পাশা তার সরকারের বিরুদ্ধে কিছু লেখা বা মুখে বলা শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য করে বিধি জারি করেন।

বিরাট সংখ্যক আলেমকে জাহাজে করে হজ্জে পাঠাবার নাম করে মাঝ সমুদ্রে ডুবিয়ে হত্যা করেন বলেও জনশ্রুতি আছে। কামাল পাশা ৩রা সেপ্টেম্বর ১৯২৫ সালে "প্রতিক্রিয়াশীলদের আবাস" শীর্ষক একটি অধ্যাদেশ জারি করে বহু মসজিদ, মাযার

(তেক্কা), এবং খানকা (তুর্বা) সরকারী শিক্ষার জন্যে বাজেয়াপ্ত করে নেয়া হয়। শেখ, দরবেশ ইত্যাদি উপাধি, তাদের রীতিনীতি, এমনকি তাদের পোশাক পরিধান দণ্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য করা হয়।

শায়খুল ইসলামের দপ্তরকে বিলুপ্ত করে ভবনটিকে যুবতীদের "সাজ-সজ্জা ও খেলাঘরে" রূপান্তরিত করা হয়। কুরআনের ভাষ্য প্রণয়ন ও প্রচার সংস্থা "দারুল হিক্‌মাকে" বন্ধ ও নিষিদ্ধ করা হয়।

১৯২৫ সালের ২৫ মে টুপি পরা নিষিদ্ধ করা হয় এবং টুপি পরা লোকদেরকে গ্রেফতার করা এবং জেলে পাঠাবার শাস্তি প্রবর্তন করা হয়। মোস্তফা কামাল পাশা তুর্কী টুপিকে অজ্ঞতা, পশ্চাদপদতা, প্রগতি ও সভ্যতার শত্রু হিসেবে গণ্য করতেন। ইসলামী লেবাস এবং বোরকা পরা তিনি নিষিদ্ধ করেন। ইয়াহুদি, নাসারা স্টাইলে মহিলাদের হাটুর উপর স্কার্ট পরার প্রথা সরকারীভাবে চালু করা হয়।

১৯২৬ সালের ১লা জানুয়ারী হিজরী পঞ্জিকা বাতিল করে গ্রেগোরিয়ান পঞ্জিকা প্রবর্তন করা হয়। ১৯২৬ সালের ১লা জুন থেকে ৪ঠা অক্টোবরের মধ্যে বহু বিধি-বিধান জারি করে ইসলামী শরীয়াহ্ আইন বিলুপ্ত করা হয় এবং সুইস সিভিল কোড প্রবর্তন করা হয়।

১৯২৬ সালের এক অধ্যাদেশবলে তুরস্কে মদ্য পান বৈধ করে ঘোষণা দেয়া হয়। সরকারী উদ্যোগে মদ তৈরীর কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। শুক্রবারের পরিবর্তে শনিবার এবং রবিবার সাপ্তাহিক ছুটি ঘোষণা করা হয়। ১৯২৭ সালে ৫ই মে এক অধ্যাদেশ বলে মাযার সংরক্ষণ ও তাসাউফ নিষিদ্ধ করা হয়।

১৯২৮ সালের ৩রা নভেম্বর আরবী হরফ এবং আরবী কুরআন নিষিদ্ধ করা হয়। ১৯৩২ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারী আরবীতে নামায আদায় করা, আযান দেয়া ও খুতবা পড়া নিষিদ্ধ করা হয়।

মূর্তি নির্মাণ সম্পূর্ণ ইসলাম বিরোধী। ১৯২৬ সনের ৩ নভেম্বর ইস্তাম্বুল শহরে কামালের মর্মর মূর্তি স্থাপিত হয়। ১৯২৭ সনের ৪ নভেম্বর আঙ্কারায় যাদুঘরের সম্মুখে কামালের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯২৮ সালে কামাল আতাতুর্ক নিজের মূর্তি নির্মাণের সরকারী নির্দেশ জারি করেন এবং এই মূর্তিকে সম্মান প্রদর্শনের আইন চালু করেন।

১৯৩৪ সনের জুন মাসে আইনের মাধ্যমে মোস্তফা কামালের নামের সঙ্গে আতাতুর্ক (তুর্কী জাতির পিতা) শব্দ যোগ এবং এ শব্দ অন্য কোনো নামের সঙ্গে ব্যবহার করা বে-আইনী ঘোষণা করা হয়।

১৯৩৪ সালে আরবী ভাষার শব্দ দিয়ে তুর্কীদের নাম রাখার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। এ ছাড়া যখনই সম্ভব এক একটি ফেরাউনী নির্দেশ জারি করে

ইসলামী চেতনা সম্পন্ন তুর্কীদের হৃদয়ে খঞ্জর চালনা করতে থাকেন। অতো কিছুর পরও তুর্কী জাতীয় জীবনে ইসলামী চেতনা নির্মূল করা সম্ভব হয়নি বরং একাংশের হৃদয়ে দৃঢ়তর হয়েছে। নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে ইসলামী চেতনা নির্ভর দলই ক্ষমতায় আসবে তুরস্কে। ইসলাম জিন্দা হোতা হয় হার কারবালা কি বাদ-এর একটি বাস্তব রূপায়ণ হলো তুরস্ক।

কামাল আতাতুর্ক লেখাপড়া জানতেন খুব কম। সাংগঠনিক ক্ষমতা ও ব্যক্তিত্বের আকর্ষণ ছিল অপরিসীম। তার বদ্ধমূল ধারণা হয়েছিল যে, ইসলামই মুসলিমদের অধঃপতনের মূল কারণ। এ ধারণা বহু দেশের কম্যুনিস্টদের মধ্যে প্রবল। তারা ক্ষমতা পেলে তুরস্কে কামাল আতাতুর্ক যা করেছেন হয়তো তা হতে কম করতো না।

খ্রিস্টান মিশনারীদের প্রভাবে কামাল আতাতুর্ক খ্রিস্ট ধর্ম ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির ছিলেন সাংঘাতিক ভক্ত। তার এ ভ্রান্ত ধারণা ছিল যে অর্থনৈতিকভাবে উন্নত ইয়াহুদী নাসারাদের মতো হলেই তুর্কী জাতির উন্নতি সাধিত হবে।

মহান দেশপ্রেমিক এবং রাষ্ট্রনায়ক হওয়ার কারণে নিজে যা ভালো বুঝতেন, তা নিষ্ঠুরতার সঙ্গে প্রয়োগ এবং বাস্তবায়ন করতে চাইতেন। তিনি দেশবাসীর ভালোবাসা পেয়েছেন সত্য কিন্তু ইসলাম বিরোধী গোঁড়ামীর জন্যে নমরুদ, ফেরাউন হিসেবেও বিবেচিত হচ্ছেন। মোস্তফা কামাল তুরস্কে ইসলামের যতটুকু ক্ষতি করেছেন পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীরা ভারত উপমহাদেশে ইসলামের তত ক্ষতি মনে হয় করেনি।

মোস্তফা কামাল পাশার ১৫ বছরের তথাকথিত রিপাবলিকান গণতান্ত্রিক শাসনামলে কোনো নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি এবং দেশে কোনো বিরোধী দলের অস্তিত্বও ছিল না। তার প্রশাসন ছিল ইসলাম বিরোধী, স্বেচ্ছাচারী ও স্বৈরতান্ত্রিক। তা সত্ত্বেও পাশ্চাত্যের গণতন্ত্র পূজারীদের নিকট মোস্তফা কামাল আতাতুর্ক হলেন এক মহামানব।

মোস্তফা কামালী ফেতনার কারণে তুরস্কে ইসলামী আন্দোলন ও ইসলাম চর্চা উল্লেখযোগ্য কিছু হয় না বলে ধারণাই স্বাভাবিক। ইসলাম বিদ্বেষ ও বিনাশে মোস্তফা কামালের সহযোগীর সংখ্যা তার ভক্তদের মধ্যে অসংখ্য হলেও তুরস্কের অমানিশার অন্ধকারেও কিছু কিছু শুকতারা স্বীয় ঔজ্জ্বল্যে দেদীপ্যমান ছিল। তাঁদের মধ্যে বদিউজ্জামান সাঈদ নূরসী (র) ছিলেন উজ্জ্বলতম।

ইফাবা—২০০৩-২০০৪—প্র/ ৯৩৫৬ (উ)—২২৫০

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত কয়েকটি জীবনী-গ্রন্থ

১. মুসলিম মনীষা	লেখকমণ্ডলী (সংকলন)	৭০.০০
২. ইমাম আযম আবূ হানীফা (র)	এ. এম. সিরাজুল ইসলাম	২০৫.০০
৩. আল্লামা জারীর তাবারী (র)	ড. মোঃ আজিজুল হক	৬০.০০
৪. শায়খুল ইসলাম সায়্যিদ হুসাইন আহমদ মাদানী (র)	ড. মুশতাক আহমদ	১১০.০০
৫. হযরত মুজাদ্দিদ আলফে সানী (র)	এ. এম. এম আবদুল আযীয ও সিদ্দিক আহমদ খান	৭০.০০
৬. হযরত ইব্রাহীম (আ) ঃ জীবন ও সময়কাল	ড. মুহাম্মদ মুজিবর রহমান	৪৩.০০
৭. সাহাবা চরিত (১ম খণ্ড)	আখতার ফারূক অনূদিত	৬৪.০০
৮. সাহাবা চরিত (৫ম খণ্ড)	মোঃ আবদুল বাতেন	২৫.০০
৯. ওমর ফারুক (রা)	মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ বাহার	৭.০০
১০. আবূ যর গিফারী (রা)	এ. বি. এম কামাল উদ্দিন শামীম	১২.০০
১১. হযরত বেলাল (রা)	আহমদ কামাল	৩.৫০
১২. হযরত আবূ বকর (রা)	এ. কে. এম মহিউদ্দিন	১৪.০০
১৩. হযরত আবু হুরায়রা (রা)	মুহাম্মদ রিজাউল করিম ইসলামাবাদী	১৩.০০
১৪. সিয়ারুস সাহাবিয়াত	মুহাম্মদ ফরীদউদ্দীন আত্তার	২০.০০
১৫. কাতেবীনে ওয়াহী	গরীবুল্লাহ মাসরুর	১০০.০০
১৬. হযরত উসমান গণী (রা)	গরীবুল্লাহ মাসরুর	২৮.০০
১৭. মহাসত্যের সন্ধানে হযরত সালমান ফারসী (রা)	শাহজাহান ইবনে হায়দার	৪০.০০
১৮. হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা)	মুহাম্মদ সিরাজুল হক অনূদিত	৬৫.০০
১৯. তৃতীয় খলীফা হযরত ওসমান (রা)	আবু সাঈদ জুবেরী	২৮.০০

লেখক পরিচিতি

জনাব এ. জেড. এম. শামসুল আলম পেশাগতভাবে একজন সরকারী কর্মকর্তা। কিন্তু সামাজিক, সাংস্কৃতিক, সাংগঠনিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক ইসলামী কর্মে সংশ্লিষ্ট। ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি গভীর অনুরাগ, আগ্রহ এবং কর্মগুণে তিনি একজন ইসলামী বুদ্ধিজীবী হিসেবে পরিচিত। তাঁর রচিত এবং প্রকাশিত ছোট বড় পুস্তক-পুস্তিকার সংখ্যা প্রায় ১০০। অনেকগুলো পুস্তক পাঠক ও বুদ্ধিজীবী মহলে ব্যাপকভাবে সমাদৃত।

জনাব এ. জেড. এম. শামসুল আলম রচিত 'ইসলামী অর্থনীতির রূপরেখা', 'ইসলামী রাষ্ট্র', 'ইসলামী ইনস্যুরেন্স', 'ইসলামী ব্যাংকিং', 'Entrepreneurial Savings', 'Islam and Family Planning', 'ইসলামী ঐতিহ্যে পরিবার পরিকল্পনা' (অনুবাদ গ্রন্থ, লেখক– আবদুর রহিম উমরান মিশরী) ইত্যাদি পুস্তক রয়েছে। তাছাড়া ইসলামী অর্থনীতি, ব্যাংকিং ইনস্যুরেন্সের উপর তাঁর লেখা শত শত প্রবন্ধ ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে।

জনাব এ. জেড. এম. শামসুল আলম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে অর্থনীতিতে এবং যুক্তরাষ্ট্রের 'ম্যাসাচুসেটস' রাজ্যের উইলিয়াম কলেজ থেকে উন্নয়ন অর্থনীতিতে এম.এ. ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৬৩ সনে সিভিল সার্ভিস অব পাকিস্তান (সিএসপি) চাকুরীতে যোগদানের পূর্বে তিনি ঢাকা কলেজ ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি বিভাগে শিক্ষকতা করেন।

তিনি আল আরাফাহ ইসলামী ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান (১৯৯৫-২০০২) এবং ইসলামী কমার্শিয়াল ইনস্যুরেন্স কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা লগ্ন (২০০১ খ্রীঃ) থেকে উপদেষ্টা আছেন। তাঁর চিন্তা ও কার্যধারায় বাস্তবতা এবং তাত্ত্বিক বিষয়ে সমন্বয় পরিলক্ষিত হয়।

সরকারী চাকুরীর শীর্ষ পর্যায়ে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বস্ত্র মন্ত্রণালয়, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সচিব, যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক ও ভাইস-চেয়ারম্যান এবং বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের রেক্টর হিসেবে (দুইবার) দায়িত্ব পালন করেন। কঠোর পরিশ্রমী ও নিবেদিত প্রাণ সরকারী কর্মকর্তা হলেও দেশ ভ্রমণ, পড়া ও লেখা তাঁর নেশা। বিভিন্ন উপলক্ষে ছয়টি মহাদেশের ৪৩টি দেশে তিনি স্বল্পকালীন ভ্রমণে গিয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্রে একাদিক্রমে চার বছর অবস্থান করেছেন। এ সময় প্রায় তিনটি বছর কেটেছে যুক্তরাষ্ট্রের লাইব্রেরী অব কংগ্রেসে মুক্ত পাঠক হিসেবে।

দেশ-বিদেশের অর্থনীতি, সমাজ-সংস্কৃতি, সমস্যা ও বাস্তবতা গভীরভাবে এবং নিকট থেকে দেখার সুযোগ তিনি পেয়েছেন।

লেখক পরিচিতি

জনাব এ. জেড. এম. শামসুল আলম পেশাগতভাবে একজন সরকারী কর্মকর্তা। কিন্তু সামাজিক, সাংস্কৃতিক, সাংগঠনিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক ইসলামী কর্মে সংশ্লিষ্ট। ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি গভীর অনুরাগ, আগ্রহ এবং কর্মগুণে তিনি একজন ইসলামী বুদ্ধিজীবী হিসেবে পরিচিত। তাঁর রচিত এবং প্রকাশিত ছোট বড় পুস্তক-পুস্তিকার সংখ্যা প্রায় ১০০। অনেকগুলো পুস্তক পাঠক ও বুদ্ধিজীবী মহলে ব্যাপকভাবে সমাদৃত।

জনাব এ. জেড. এম. শামসুল আলম রচিত 'ইসলামী অর্থনীতির রূপরেখা', 'ইসলামী রাষ্ট্র', 'ইসলামী ইনস্যুরেন্স', 'ইসলামী ব্যাংকিং', 'Entrepreneurial Savings', 'Islam and Family Planning', 'ইসলামী ঐতিহ্যে পরিবার পরিকল্পনা' (অনুবাদ গ্রন্থ, লেখক– আবদুর রহিম উমরান মিশরী) ইত্যাদি পুস্তক রয়েছে। তাছাড়া ইসলামী অর্থনীতি, ব্যাংকিং ইনস্যুরেন্সের উপর তাঁর লেখা শত শত প্রবন্ধ ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে।

জনাব এ. জেড. এম. শামসুল আলম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে অর্থনীতিতে এবং যুক্তরাষ্ট্রের 'ম্যাসাচুসেটস' রাজ্যের উইলিয়াম কলেজ থেকে উন্নয়ন অর্থনীতিতে এম.এ. ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৬৩ সনে সিভিল সার্ভিস অব পাকিস্তান (সিএসপি) চাকুরীতে যোগদানের পূর্বে তিনি ঢাকা কলেজ ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি বিভাগে শিক্ষকতা করেন।

তিনি আল আরাফাহ ইসলামী ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান (১৯৯৫-২০০২) এবং ইসলামী কমার্শিয়াল ইনস্যুরেন্স কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা লগ্ন (২০০১ খ্রীঃ) থেকে উপদেষ্টা আছেন। তাঁর চিন্তা ও কার্যধারায় বাস্তবতা এবং তাত্ত্বিক বিষয়ে সমন্বয় পরিলক্ষিত হয়।

সরকারী চাকুরীর শীর্ষ পর্যায়ে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বস্ত্র মন্ত্রণালয়, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সচিব, যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক ও ভাইস-চেয়ারম্যান এবং বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের রেক্টর হিসেবে (দুইবার) দায়িত্ব পালন করেন। কঠোর পরিশ্রমী ও নিবেদিত প্রাণ সরকারী কর্মকর্তা হলেও দেশ ভ্রমণ, পড়া ও লেখা তাঁর নেশা। বিভিন্ন উপলক্ষে ছয়টি মহাদেশের ৪৩টি দেশে তিনি স্বল্পকালীন ভ্রমণে গিয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্রে একাদিক্রমে চার বছর অবস্থান করেছেন। এ সময় প্রায় তিনটি বছর কেটেছে যুক্তরাষ্ট্রের লাইব্রেরী অব কংগ্রেসে মুক্ত পাঠক হিসেবে।

দেশ-বিদেশের অর্থনীতি, সমাজ-সংস্কৃতি, সমস্যা ও বাস্তবতা গভীরভাবে এবং নিকট থেকে দেখার সুযোগ তিনি পেয়েছেন।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ